ISSN 2222-5188

ইনফো মেডিকাস

জানুয়ারী-মার্চ ২০১৩ | ২য় পর্ব, ১ম সংখ্যা | চিকিৎসা সাময়িকী

- বিশেষ প্রবন্ধ
- ছবি দেখে রোগ নির্ণয়
- রোগ ও চিকিৎসা
- ছবির বর্ণনা দ্বারা রোগ নির্ণয়
- জরুরী পদ্ধতি

সূচী

বিশেষ প্রবন্ধ ৩

ছবি দেখে রোগ নির্ণয় ৫

রোগ ও চিকিৎসা ৬

ছবির বর্ণনা দ্বারা রোগ নির্ণয় ১০

জরুরী পদ্ধতি ১১

স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ১২

স্বাস্থ্য সংবাদ ১৩

ইনফো কুইজ ১৫

সম্পাদক মণ্ডলী

এম মহিবুজ জামান
ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান
ডাঃ তারেক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম

প্রকাশনায়

মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট
এসিআই ফার্মাসিউটিক্যালস্
নভো টাওয়ার, ১০ম তলা
২৭০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮

ডিজাইন

ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন লিঃ
রোড # ১২৩, বাড়ী # ১৮এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ,

ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা রইল।

২০১৩ সালের প্রথম সংখ্যাটি আপনাদের হাতে পৌঁছে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। আশা করি আপনারা এই সংখ্যাটি পড়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক কিছু জানতে পারবেন। গত বছর এর সংখ্যাগুলোর প্রতি আপনাদের প্রতিক্রিয়া আমাদেরকে অনুপ্রানিত করেছে।

তাই আমরা চেষ্টা করেছি এই সংখ্যায় নতুন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে, যার মধ্যে আছে "বিশেষ প্রবন্ধ" যেখানে গর্ভকালীন সময়ে মায়ের যত্ন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আশা করি আপনারা এই বিশেষ প্রবন্ধটি পড়ে উপকৃত হবেন। "ছবি দেখে রোগ নির্ণয়" আমাদের আরেকটি নতুন সংযোজন। এখানে ১২টি চর্মরোগের ছবি দেয়া হয়েছে- ছবি গুলো দেখে আপনারা রোগগুলোর ক্লিনিকাল বৈশিষ্ট্য জানতে পারবেন। আরও একটা নতুন সংযোজন "ক্লিনিকাল চিত্রের বর্ণনা দ্বারা রোগ নির্ণয়"- যেখানে ২টি রোগের ছবির (প্রস্টেট ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ দ্বারা স্তন বৃদ্ধি এবং বাকযন্ত্রে প্যারাসাইটের সংক্রমণ) বর্ণনা করা হয়েছে।

এর পাশাপাশি নিয়মিত বিভাগগুলো আগের মতই উপস্থাপন করা হয়েছে। বরাবরের মত আমরা "ইনফো মেডিকাস" সম্পর্কিত আপনাদের পরামর্শ ও প্রতিক্রিয়াকে স্বাগত জানাই।

সর্বশেষে সম্পাদক মন্ডলীর পক্ষ থেকে আমরা আপনাদের সুস্থ, সুন্দর, সুখী এবং সফল জীবন কামনা করি।

ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছান্তে,

(ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান)
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ম্যানেজার

বিশেষ প্রবন্ধ

গর্ভকালীন যত্ন

গর্ভকালীন সময়ে মায়ের চাই বিশেষ যত্ন। মহিলাদের গর্ভধারনের পূর্বেই নিজের স্বাস্থ্য, গর্ভধারণ ও সন্তান পালন সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার। কারণ একজন সুস্থ্য মা-ই পারে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক শিশুর জন্ম দিতে। তাই গর্ভবতী মায়ের জন্য প্রয়োজন সঠিক যত্ন ও পরিচর্যা। গর্ভকালীন যত্ন বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার কমাতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করতে পারে।

গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

গর্ভবতী মায়ের লক্ষণ

- মাসিক বন্ধ থাকা।
- বমি বমি ভাব।
- স্তনে ব্যথা।

গর্ভকালীন সময়ে মায়ের যত্ন

সমগ্র গর্ভকালীন সময়ে অর্থাৎ ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়া থেকে শুরু করে ৯ মাস ৭ দিন ব্যাপী মাঝখানে গর্ভবতী মা ও তার পেটের সন্তানের যত্ন নেওয়াকে গর্ভকালীন যত্ন বলা হয়। নিয়মিত পরীক্ষা এবং উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়। সমগ্র গর্ভকালীন সময়ে কম পক্ষে ৪ বার চিকিৎসকের নিকট যেয়ে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

- ১ম ভিজিটঃ ১৬ সপ্তাহ (৪ মাস)।
- ২য় ভিজিটঃ ২৪-২৮ সপ্তাহ (৬-৭ মাস)।
- ৩য় ভিজিটঃ ৩২ সপ্তাহ (৮ মাস)।
- ৪র্থ ভিজিটঃ ৩৬ সপ্তাহ (৯ মাস)।

গর্ভকালীন যত্নের উদ্দেশ্য

গর্ভকালীন যত্নের প্রধান উদ্দেশ্য হলো গর্ভবতী মাকে মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থতার মাঝে তৈরী করে তোলা যাতে তার প্রসব স্বাভাবিক হয়, তিনি যেন একটি স্বাভাবিক সুস্থ শিশু জন্ম দেন, সন্তানকে বুকের দুধ দিতে পারেন এবং সন্তোষজনকভাবে তার এবং শিশুর যত্ন নিতে পারেন।

গর্ভকালীন যত্নের কার্যাবলী

- মায়ের কোন অসুখ থাকলে তা নির্ণয় করা এবং তার চিকিৎসা করা যেমন-গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ, প্রি-একলাম্পশিয়া বা একলাম্পশিয়া এবং বাঁধাপ্রাপ্ত প্রসবের পূর্ব ইতিহাস।
- মা যাতে গর্ভকালীন সময়ে নিজের যত্ন নিতে পারেন, আসন্ন প্রসবের জন্য নিজে তৈরী হতে পারেন এবং নবজাত শিশুর যত্ন নিতে পারেন তার শিক্ষা দেয়া।
- গর্ভাবস্থায় জটিল উপসর্গগুলি নির্ণয় করা। এর ব্যবস্থাপনা করা যেমন- রক্ত স্বল্পতা, প্রি-একলাম্পশিয়া ইত্যাদি।
- ঝুকিপূর্ণ গর্ভ সনাক্ত করা।
- উপদেশের মাধ্যমে মাকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করা, রক্তস্বল্পতা, ম্যালেরিয়া এবং ধনুষ্টংকারের প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেয়া।
- নিরাপদ প্রসব বাড়ীতে না স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোথায় সম্ভব হবে তা নির্বাচন করা।
- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীর ব্যবস্থা করা।
- সকল গর্ভবতী মায়ের রেজিষ্ট্রেশন করা।

বাড়িতে কিভাবে গর্ভবতীর যত্ন নেয়া যায়

- সকল গর্ভবতীকে হাসি খুশি রাখা।
- গর্ভবতী মাকে একটু বেশী খেতে দেয়া।
- খাবার যাতে সুষম হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা।
- বেশী করে পানি খেতে বলা।
- পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মাধ্যমে সহায়তা দেয়া।
- পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে বলা।
- তাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত রাখা।
- গর্ভবতী মা অসুস্থ হলে তাড়াতাড়ি স্বাস্থ্য কর্মী বা ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া।

গর্ভবতী মায়ের খাবারের তালিকা

শক্তিদায়ক খাবার-যেমনঃ ভাত, রুটি/পরাটা, আলু, চিনি, গুড়, সুজি, সয়াবিন তেল, বাদাম, কলিজা, ঘি/মাখন, ডিমের কুসুম ইত্যাদি।

শক্তি ক্ষয়পূরণ এবং নবজাতকের শরীর বৃদ্ধিকারক খাবার-যেমনঃ

- মাছ, মাংস, দুধ, ডিমের সাদা অংশ।
- বিভিন্ন ধরনের ডাল, মটরশুটি, সীমের বীচি ইত্যাদি।

গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টি

শক্তি ও রোগ প্রতিরোধক খাবার-যেমনঃ

- সবুজ, হলুদ ও অন্যান্য রঙ্গিন শাক-সবজি।
- সবধরনের মৌসুমী ফল-মূল।

গর্ভবতী মা কি খাবেন, কি পরিমাণ খাবেন

- প্রতিদিন তিন ধরণের খাবারের তালিকা থেকেই কিছু কিছু খাবার খেতে হবে।
- প্রতিবেলায় স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশী খেতে হবে।
- গভর্বতী মাকে বেশী করে পানি খেতে হবে।
- আয়োডিনযুক্ত লবণ তরকারীর সাথে খেতে হবে। তবে অতিরক্ত লবণ খাওয়া যাবে না।

গর্ভবতী অবস্থায় করণীয়

- গর্ভাবস্থায় স্বাস্থ্য সেবাদানকারীর অথবা ডাক্তার দ্বারা কমপক্ষে ৪ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে।
- গর্ভাবস্থায় ২টা টি টি টিকা নিতে হবে।
- দৈনিক স্বাভাবিকের চেয়ে সাধ্যমত বেশি খাবার খেতে হবে।
- গর্ভবতী মহিলাকে নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে পানি খেতে হবে।
- গর্ভবতী মহিলাকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। তাকে নিয়মিত গোসলও করতে হবে।

গর্ভবতী মহিলাকে টি টি ইনজেকশন (ইম্যুনাইজেশন) দেওয়া হচ্ছে

- দুপুরের খাবারের পর কমপক্ষে ১-২ ঘন্টা বিশ্রাম নিতে হবে।

গর্ভবতী অবস্থায় যা করা যাবে না

- গৃহস্থালীর কঠিন কাজ যেমন-ধান মাড়াই, ধান ভানা, ঢেঁকিতে চাপা ইত্যাদি।
- ভারী কোন কিছু তোলা।
- দূরে যাতায়াত করা এবং ভারী কিছু বহন করা ।
- শরীরে ঝাঁকি লাগে এমন কাজ করা ।
- দীর্ঘ সময় কোন কাজে লিপ্ত থাকা।
- ঝগড়া ঝাটি এবং ধমক দেয়া।
- জর্দা, সাদা পাতা খাওয়া।
- তামাক, গুল ব্যবহার করা।
- ধূমপান বা অন্য কোন নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করা।
- স্বাস্থ্য কর্মী বা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন ঔষধ গ্রহণ করা।

গর্ভকালীন প্রয়োজনীয় ৪ টি ব্যবস্থা

- প্রসবের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রী বা স্বাস্থ্য সেবা দানকারীকে আগে ঠিক করে রাখতে হবে।
- প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সময়ে বাড়তি খরচ এবং জরুরী ব্যবস্থা আগে ঠিক করে রাখতে হবে।
- প্রসবকালে গর্ভবতী মায়ের অতিরিক্ত রক্তের প্রয়োজন হতে পারে। তাই গর্ভবতী মায়ের রক্তের গ্রুপে মিল আছে এমন তিন জন সুস্থ্য ব্যক্তিকে রক্ত দানের জন্য আগে ঠিক করে রাখতে হবে এবং
- গর্ভকালীন কোন রকম জটিলতা দেখা দিলে তাকে দ্রুত হাসপাতলে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য যানবাহন চালকের (ভ্যানগাড়ির চালক বা নৌকার মাঝি) সাথে আগে থেকে কথা বলে রাখতে হবে।

গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের সময় ৫ টি বিপদ চিহ্ন

গর্ভকালীন জটিলতার ফলে মা ও শিশু উভয়ের জীবনের ঝুকি দেখা দেয়। ৫ টি বিপদ চিহ্নের মাধ্যমে এসব জটিলতা ধরা যায়। এরকম অবস্থায় মায়েদের জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন। এই ৫টি বিপদ চিহ্ন হলোঃ

- গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় বা প্রসবের পর খুব বেশি রক্তস্রাব, গর্ভফুল না পড়া।
- গর্ভাবস্থায় বা প্রসবের পর তিনদিনের বেশি জ্বর বা দুর্গন্ধ যুক্ত স্রাব।
- গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে ও প্রসবের পরে শরীরে পানি আসা, খুব বেশি মাথা ব্যাথা, চোখে ঝাপসা দেখা।
- গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময় বা প্রসবের পরে খিঁচুনী।
- প্রসব ব্যথা ১২ ঘন্টার বেশি থাকা ও প্রসবের সময় বাচ্চার মাথা ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ প্রথমে বের হওয়া।

গর্ভাবস্থায় ঔষধ সেবন?

গর্ভকালীন সময়ে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন ঔষধ খাওয়া উচিত না। অপ্রয়োজনীয় কোন ঔষুধ একদম খাওয়া ঠিক না।

ছবি দেখে রোগ নির্ণয়

একনি

কনটাক্ট ডারমাটাইটিস্

একজিমা

হারপিস সিমপ্লেক্স

ইমপেটিগো

কিলিয়েডস্

লিচেন প্লেনাস

মেলানোমা

সোরিয়াসিস

রোসাসিয়া

স্ক্যাবিস

ভিটিলিগো

রোগ ও চিকিৎসা

থাইরয়েডের অসুখ

থাইরয়েড গ্রন্থিকে দেখতে একটা বো-টাই বা প্রজাপতির মতো এটি থাকে গলার নিচের দিকে কণ্ঠার হাড়ের একটু উপরে

থাইরয়েড (Thyroid) হল দেহের একটি অন্তস্রাবী গ্রন্থি (Endocrine gland)। থাইরয়েড গ্রন্থি যে রস তৈরি করে রক্তে মিশিয়ে দেয়, সেটিকে বলা হয় থাইরয়েড হর্মোন এই হর্মোনের কাজ হল দেহের মেটাবলিজম, অর্থাৎ শরীরের কোষগুলি কী হারে শক্তি ব্যয় করবে সেটা নিয়ন্ত্রণ করা। থাইরয়েড গ্রন্থিকে দেখতে একটা বো-টাই বা প্রজাপতির মতো এটি থাকে গলার নিচের দিকে কণ্ঠার হাড়ের একটু উপরে। আকারে এটি ছোট, স্বাভাবিক অবস্থায় বাইরে থেকে এর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড কতটা হর্মোন ক্ষরণ করছে সেটা নিয়ন্ত্রণ করে আরেকটি অন্তস্রাবী গ্রন্থি, পিটিউটারি গ্রন্থি (Pituitary gland), যেটি মাথার খুলির নিচে অবস্থিত। পিটিউটারি গ্রন্থি নিজেও এক ধরণের হর্মোন তৈরি করে এবং সেই হর্মোন কম বেশী থাইরয়েডে পাঠিয়ে থাইরয়েড-নিসৃত হর্মোনের পরিমান নিয়ন্ত্রন করে।

থাইরয়েড যদি অধিক মাত্রায় হর্মোন তৈরি করে, তাহলে জৈবিক প্রক্রিয়ার জন্য যে পরিমান শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন দেহকোষগুলি তার বেশী ব্যবহার করে। এই অবস্থাকে বলা হয়, হাইপারথারয়েডিজম। অন্যদিকে থাইরয়েড গ্রন্থি যদি অল্প পরিমান হর্মোন তৈরী করে, তাহলে দেহকোষগুলি তার স্বাভাবিক প্রয়োজনের তুলনায় কম শক্তি ব্যয় করে। এই অবস্থাকে বলা হয়, হাইপোথাইরয়েডিজম। বহু কারণের এই দুই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। সাধারণত থাইরয়েডের সমস্যায় ছেলেদের থেকে মেয়েরাই বেশী ভোগে (প্রায় ছয়-সাত গুন বেশী)।

বিভিন্ন কারণে এটি হতে পারে যেমন ঃ

- থাইরয়েডাইটিস, অর্থাৎ থাইরয়েডের গ্রন্থির কোনো সংক্রমণ ঘটলে সেটি অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমানে হর্মোন প্রস্তুত করে।
- শরীরে আয়োডিনের অভাব হলে থাইরয়েড গ্রন্থির হর্মোন তৈরির ক্ষমতা কমে যায়। (এই সমস্যাটা দূর করার জন্য বহু দেশেই লবন বা নুনের সঙ্গে আয়োডিন যোগ করার (Iodized salt) প্রচলন আছে।
- সন্তানের জন্ম দেবার পর প্রায় ৫ শতাংশের মত মায়েরা পোস্টপার্টাম থাইরয়েডাইটিস (Postpartum thyroiditis) - এ ভোগে এটি সাধারণত স্বল্পকালীন সমস্যা।
- কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুরা জন্মায় অকেজো থাইরয়েড নিয়ে। (এক্ষেত্রে আশু চিকিৎসার প্রয়োজন, অন্যথায় শিশুরা শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রতিবন্ধি হয়ে যায়।)
- জন্মসূত্রে প্রাপ্ত দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতার ঘাটতির জন্যও থাইরয়েড সমস্যা হতে পারে।

কি কি কারণে হাইপারথাইরয়েডিজম হয়?

- থাইরয়েড গ্রন্থি অনেক সময়ে বড় হয়ে গিয়ে অত্যাধিক হর্মোন তৈরি করে। এটিকে অনেক সময় ডিফিউসড টক্সিক গয়টার বা গ্রেভের অসুখ (Graves disease) বলা হয়।
- থাইরয়েডের মধ্যে এক বা একাধিক গুটি (Nodules) অতিক্রিয়াশীল হয়ে যেতে পারে। এই অবস্থাকে টক্সিক বা মাল্টি-নুডলার টক্সিক গয়ট্যা বলা হয়।
- থাইরয়েডের অসুখের (Thyroditis) জন্যও অনেক সময়ে অত্যাধিক হর্মোন ক্ষরিত হতে পারে।
- অত্যাধিক আয়োডিনের প্রভাবে (এই আয়োডিন কিছু কিছু ওষুধে বা আয়োডাইজড লবনে থাকে আসতে পারে) থাইরয়েড কম বা বেশী পরিমানে হর্মোন তৈরি করতে পারে।

হাইপারথাইরয়েডইজম-এর লক্ষণ

- নার্ভাস বা খিটখিটে আচরণ।
- পেশী কাঁপা বা পেশীতে জোরের অভাব।
- ওজন কমে যাওয়া।
- ঘুমের ব্যাঘাত।
- থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে ওঠা।
- দেখার সমস্যা বা চোখে অস্বস্তি।
- গরমে অসুবিধা হওয়া।

কি কি কারনে হাইপোথাইরয়েডইজম হয়?

- যদি জন্মগতভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি অনুপস্থিত থাকে।
- যদি গর্ভকালীন সময়ে মায়ের আয়োডিন ঘাটতি থাকে।
- যদি খাবার এ আয়োডিন ঘাটতি থাকে।
- শল্যচিকিৎসা করে থাইরয়েড গ্রন্থি অপসারন করলে।
- থাইরয়েড গ্রন্থি রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধের ফলে।

হাইপোথাইরয়েডিজমের রোগলক্ষণ

- ক্লান্তিভাব।
- ঋতুমতী নারীদের ঘন ঘন ঋতু এবং অত্যাধিক রক্তস্রাব হওয়া।
- ভুলে যাওয়া।
- ওজন বৃদ্ধি।
- চামড়া শুকিয়ে খসখসে হয়ে যাওয়া।
- গলার স্বর ভেঙ্গে যাওয়া।
- ঠান্ডা সহ্য করতে না পারা।

রোগ নির্ণয়

- থাইরয়েড ফাংসন পরীক্ষা করে (উদাহরণ- T_3, T_4, TSH)।
- বুকের এক্সরে করে।
- ফাইন নীডেল এসপিরেশন (FNAC) করে।

চিকিৎসা

এর চিকিৎসার মুলে রয়েছে শরীরের রক্তে থাইরয়েড হর্মোন ঠিক মাত্রায় রাখা। হাইপোথাইরয়েডিজম এর ক্ষেত্রে সিন্থেটিক হর্মোন ট্যাবলেট খাইয়ে রক্তে হর্মোনের স্বল্পতা বা অভাব দূর করা যায়। হাইপারথাইরয়েড অসুখ সারানোটা অপেক্ষাকৃত কঠিন অনেক সময়ে ওষুধ দিয়ে হর্মোন তৈরি করা বন্ধ করা হয়। একটা প্রচলিত পদ্ধতি হল রেডিও অ্যাক্টিভ আয়োডিন দিয়ে থাইরয়েডকে অকেজো করা। এছাড়া ক্ষেত্রবিশেষে সার্জারি করে গ্রন্থিটিকে বাদ দিতেও হতে পারে। থাইরয়েডের অসুখগুলি বহু ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ সারানো যায় না। তবে সারাজীবন ডাক্তারের তত্ত্বাবধায়নে থেকে রোগী সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে।

পিত্ত পাথর

গল-ব্লাডার (পিত্তাশয়) ও বাইল ডাক্ট-এর (পিত্ত-নালী) ভিতরে অনেক সময় যে পাথরের নুড়ির মতন কঠিন বস্তু পাওয়া যায় তাকেই গলস্টোন বলা হয়।

রোগ বৈশিষ্ট্য

- পেটের উপরের দিকে অল্প অস্বস্তি।
- জন্ডিস থাকতে পারে।
- পেট ভারি লাগা।
- পেটের উপরের দিকে ও ডান পাশে (কোনও সময়ে প্রায় কাধ পর্যন্ত) ব্যথা ও সেই সঙ্গে বমি হয়।
- পাথর যদি পিত্ত-নালীতে হয়, তাহলে মাঝে মাঝে তীব্র ব্যথা ও তার সঙ্গে বমি হয়।
- অনেক সময়ে কোনও রকমের অসুবিধাই বোঝা যায় না।

সম্ভাব্য কারণ

খাদ্যে অত্যাধিক ফ্যাট বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ, গল-ব্লাডারে ক্রনিক ইনফ্লামেশন (Inflammation)।

সম্ভাব্য জটিলতা

যদি কোন পাথর পিত্ত-নালী আটকে পিত্ত-রসের নির্গমনের পথ রুদ্ধ করে দেয়, তবে তার ফলে জন্ডিস ও প্যানক্রিয়াটাইটিস রোগ হতে পারে।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা

- রোগ নির্ণয়ের জন্য এক্স-রে বা আলট্রা সোনোগ্রাফি পরীক্ষা করা।
- খাদ্য বিষয়ে কিছু সতর্কতা পালন (যেমন ফ্যাট জাতীয় খাবার বর্জন) করা।
- ব্যথা কমানোর ওষুধ নেওয়া।
- লিথোট্রিপসি অর্থাৎ আলট্রাসাউন্ডের সাহায্যে গলস্টোনকে চূর্ণ করা।
- সার্জারি - সাধারণ (Open surgery) অথবা ল্যাপারোস্কোপি।

আমাশয় / রক্তামাশয়

বৃহৎ অন্ত্রের দেয়ালের বিভিন্ন সংক্রমণকে আমাশয় (রক্তামাশয়) রোগ বা ডিসেন্ট্রি (Dysentery) বলা হয়। এর রোগ লক্ষণ হলে পেট ব্যথা, বার বার মলত্যাগ এবং মলের মধ্যে আম (Mucus) এবং অনেক সময়ে রক্ত ও অল্প অল্প পুঁজ বের হওয়া। মলত্যাগ করতেও কষ্ট হয়। অন্য উপসর্গের মধ্যে জ্বর ও বমিও হতে পারে। আমাশয় রোগের প্রধান কারণ হল শিগেলা (Shigella) জাতীয় জীবানুর সংক্রমণ অথবা এক ধরণের অ্যামিবা-র সংক্রমণ। প্রথম ধরণের আমাশয়কে ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি (Bacillary dysentery) বলা হয়। দ্বিতীয় ধরণের আমাশয় হল অ্যামেবিক ডিসেন্ট্রি (Amebic dysentery)। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ শিশুই পাঁচ বছর বয়স হবার আগেই আমাশয়ে ভোগে। অনেক সময়ে ঠিকমত চিকিৎসা না করা হলে এতে মৃত্যু ঘটে। যদি এটি মূলত গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের ঘটে, কিন্তু অন্যান্য জায়গাতেও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এটি মাঝেমধ্যে আত্মপ্রকাশ করে।

কি করে এই রোগটি হয়?

সাধারণত এটি খাবারের সঙ্গে (দূষিত পানি বা খাবার) শরীরে প্রবেশ করে। অসুস্থ ব্যক্তির ঘন সান্নিধ্যে থাকলেও এটি দেহে প্রবেশ করতে পারে।

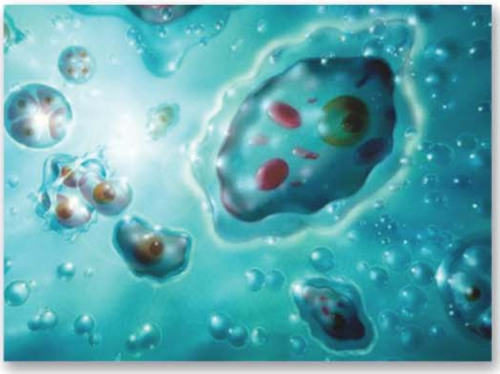

এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা

ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি

জীবাণুর উপর নির্ভর করছে- এটি কতটা বিপদজ্জনক যেটি সবচেয়ে মারাত্মক সেটিকে অনেক সময়ে মহামারী আমাশয় (Epidemic dysentery) বলা হয়। এটির মূলে হল শিগেলা জীবাণুর একটি বিশেষ জাত - ব্যাক্টেরিয়াম শিগেলা ডিসেন্টেরিয়া টাইপ ১। এই আমাশয়ে সাধারণত মলের মধ্যে রক্ত দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া শিগেলা পরিবারের আরও তিন রকম জীবাণু - শিগেলা ফ্লেক্সানারি, শিগেলা সোন্নেই ও শিগেলা বোয়াডি-আন্ত্রিক রোগ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সেগুলো অত ভয়াবহ নয়। আরও নানান ধরণের জীবাণুর আক্রমণেও আমাশয় হতে পারে।

অ্যামেবিক ডিসেন্ট্রি

এটি হয় যখন অন্ত্রে এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা *(Entamoeba histolytica)* বলে এক ধরণের পরজীবির (Parasite) সংক্রমণ হয়। এটির চিকিৎসা সময়মত না করা হলে রোগীর মৃত্যু ঘটতে পারে। এই পরজীবিগুলি অন্ত্রনালী ভেদ করে রক্তের মধ্যে মিশে যকৃত, ফুসফুস এমনি কি মস্তিস্ককেও সংক্রামন ঘটাতে পারে।

দুভাগে এই পরজীবি পানি বা খাবারে থাকে

(১) মুক্ত অ্যামিবা হিসেবে (২) অনেকগুলি অ্যামিবার একটা একটি আশ্রয়পদ আবরণী (Cyst) হিসেবে যেগুলি রোগীদের বিষ্ঠার মধ্যে পাওয়া যায়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এগুলি পানিতে ও খাবারের মধ্যে চলে আসে।

সাধারণভাবে মুক্ত অ্যামিবা - যুক্ত খাবার খেলে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ নেই। কারণ সেগুলি পেটের অম্লতায় নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আবরণী সংরক্ষিত অ্যামিবাগুলি পেটে গেলে অসুস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে খুবই বেশী।

আমাশয় রোগের প্রতিকার

সাধারণভাবে জীবানুমুক্ত পানি খাওয়া এবং ভালোভাবে রান্না করে খাওয়া খাবার খেলে এই রোগ হবার সম্ভাবনা প্রায় থাকেই না। পানি যদি ১০ থেকে ১৫ মিনিট ফোটানো হয় (যে সব জায়গা সমুদ্রপৃষ্ট থেকে অনেক উচুঁতে - সেখানে আরও বেশী সময় ধরে) এবং তারপর ঢাকা দিয়ে ঠান্ডা করা হয়, তাহলে সেটা জীবাণুমুক্ত থাকবে। এছাড়া পানি বিশুদ্ধ করার যে সব ট্যাবলেট পাওয়া যায়, সেগুলোও ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু সব জীবাণুর ক্ষেত্রে সেগুলো কার্যকারী নয়। যেসব খাবার না খাওয়া উচিত-সেগুলো হল স্যালাড, খোসা শুদ্ধু ফল, আইসক্রিম, বাইরের বরফ দেওয়া ঠান্ডা পানীয় ইত্যাদি।

রোগ নির্ণয় করার উপায়

মল পরীক্ষায় এই রোগ সহজেই ধরা পড়ে। তবে সাধারণত লক্ষণ দেখে আমাশয় হয়েছে কিনা মোটামুটি বোঝা যায়।

চিকিৎসা

শক্ত সমর্থ লোকদের ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি আপনা আপনিই সেরে যায়। কিন্তু কম বয়সী বা বয়স্ক লোকদের অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত টাইপ ১ এর ক্ষেত্রে অনেক সময়ে অ্যান্টিবায়োটিক ভালো কাজ করে না।

অ্যামিবিক আন্ত্রিকের ওষুধ হল মেট্রোনিডাজোল (Metronidazole) বা ঐ জাতিয় কোনো ওষুধ। কিন্তু যদি রোগটা অনেক দূর গড়ায় এবং অন্ত্রনালীতে ছিদ্র হয়ে থাকে, তাহলে হাসপাতালে গিয়ে বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

এই রোগে যেটা বিশেষ প্রয়োজন সেটা হল শরীরের সঠিক যত্ন নেওয়া। এই রোগে বারবার মলত্যাগ হওয়ায় শরীরের পানি ও লবন নিঃশেষিত হয়। সেইজন্যই রোগীকে প্রচুর পানি খাওয়ানো, দরকার হলে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে স্যালাইন দেওয়া বা তাকে রিহাইড্রেশন স্যালাইন খাওয়ানো বিশেষ প্রয়োজনীয়।

টাইফয়েড

অসুখের মূলে হল সালমোনেল্লা টাইফি *(Salmonella Typhi)* নামে এক রকমের জীবানু। ঠিকমত চিকিৎসা না হলে এই অসুখে জীবন নাশের সম্ভাবনা থাকে। উন্নত দেশগুলিতে এই অসুখ বেশী দেখা যায় না, কিন্তু পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলিতে টাইফয়েড একটি পরিচিতি অসুখ - এক কোটিরও বেশী লোক প্রতি বছরে এতে আক্রান্ত হয়।

কি করে এই অসুখ সংক্রমিত হয়?

সালমোনেল্লা টাইফি জীবানু মানুষের শরীরে বাস করে। যে টাইফয়েড রোগে ভুগছে, তার রক্তের মধ্যে ও তার অন্ত্রের ভেতর এটি পাওয়া যায়। এছাড়া কিছু লোক আছে যে তারা নিজেরা অসুখ থেকে সেরে উঠেছে, কিন্তু তাও শরীরে রোগের জীবানু বহন করছে। এদের বলা হয় রোগবাহক (Carriers)। রোগী ও রোগবাহকদের বিষ্ঠায় এই জীবানু থাকে।

যেখানে পয়ঃণালীর সুব্যবস্থা নেই, সেখানে অনেক সময়েই পানির মধ্যে এই জীবানুগুলো এসে পড়ে। সেই পানি খেলে বা অন্য কোনো খাবার সেই পানিতে ধুয়ে খেলে রোগসংক্রামণের সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া রোগী বা রোগবাহক যেসব খাবার বা পানীয়তে হাত দিয়েছে সেগুলো খেলেও এই রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই যেখানে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার প্রচলন নেই বা পানিতে জীবানুগুলি ছড়িয়ে পড়েছে সেখানেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। পানি বা খাবারের মধ্যে দিয়ে পেটে গিয়ে এই জীবানু বংশ বৃদ্ধি করে, ফলে জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়।

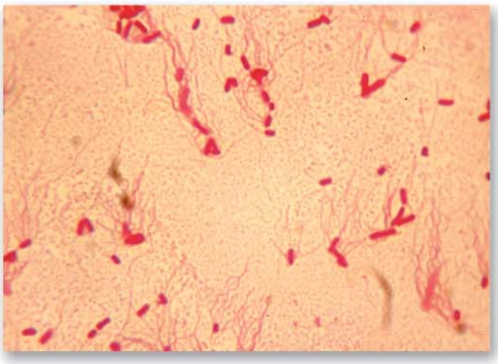

সালমোনেল্লা টাইফি

টাইফয়েডের লক্ষণ

প্রথম সপ্তাহ

- জ্বর ৯৯ ডিগ্রি - ১০০ ডিগ্রি ফাঃ এর মধ্যে থাকে। প্রতিদিন সকালের দিকে জ্বর আসে কিন্তু জ্বর পুরাপুরি ভাবে ভাল হয় না। এ জ্বরের চার্ট করলে তা একটা মইএর মত (Like ladder) দেখা যায়।
- মাথা ব্যথা।
- গা, হাত ও পা এ ব্যাথা।
- বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
- জিহ্বাহে লাল মার্জিন থাকে, মুখের রঙ ফেকাশে হয়, গন্ড স্থল লালচে দেখা যায়।
- জ্বর নামার সময় ঘাম হয়। ঘাম হয়ে জ্বর কমে তবে ছাড়ে না।
- অনেক সময় ৬ - ৭ দিনের মাথায় চামড়াতে লালচে ফুসকুড়ি দেখা যায়।

দ্বিতীয় সপ্তাহ

- দ্বিতীয় সপ্তাহে লক্ষণ গুলি প্রায়ই বেড়ে যায় কিন্তু লক্ষণে কিছু কিছু পার্থক্য থাকে।
- মাথা ব্যথা কমে বা থাকে না- দূর্বলতা খুব বেড়ে যায়।
- ঠোট ফেটে যায়, জিহ্বা শুকিয়ে যায়। ঠোটের কোন ফেটে ঘা হতে পারে।
- এই সপ্তাহে জ্বর ১০৩ ডিগ্রি - ১০৪ ডিগ্রি ফাঃ উঠে।
- এই সপ্তাহের শেষের দিকে রোগী প্রলাপ বকতে থাকে।

তৃতীয় সপ্তাহ

- এই সপ্তাহের প্রথম দিকে দ্বিতীয় সপ্তাহের লক্ষণ গুলি প্রবলই থাকে।
- এই সপ্তাহের শেষের দিকে তাপমাত্রা কিছু কমে, কিন্তু তাপমাত্রা রোজ উঠা নামার ভাব ঠিক থাকে।
- পায়খানার সঙ্গে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণ হতে থাকে।
- রোগী নড়া চড়া করতে পারে না এবং কখনও কখনও সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়।
- টাইফয়েড কোমা এই সপ্তাহের প্রধান লক্ষণ।
- হাত, পা ও জিহ্বাতে কম্পন দেখা যায়।
- পেট খুব ফেঁপে যায়।

তৃতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে রোগীর জ্বর কমতে থাকে এবং রোগী আরোগ্যর দিকে যায়। যদি চিকিৎসায় কোনও ব্যর্থতা হয় তবে এই সপ্তাহেই রোগী মারা যায়।

চতুর্থ সপ্তাহ

- এই সপ্তাহে রোগীর তাপমাত্রা কমে যায় এবং স্বাভাবিক হয়ে যায়।
- এই সপ্তাহে আবার জ্বরের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। যদি জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন রোগীর মৃত্যু ও হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

- রোগের উপসর্গ দেখে রোগ নির্ণয় করা যায়।
- জ্বরের প্রতিদিনের উঠা নামা বা মই এর মত (Like ladder) তালিকা দেখে রোগ নির্ণয় করা যায়।
- জিহ্বাহে লাল মার্জিন দেখে ও রোগ নির্ণয় করা যায়।
- রক্ত পরীক্ষা করে নিশ্চিতভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়। এই রক্ত পরীক্ষার নাম হল ভিডাল পরীক্ষা (Widal Test)। সাধারণত ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে রক্ত কালচার করলে নিশ্চিতভাবে রোগে ধরা পড়ে।

চিকিৎসা

সময় মত চিকিৎসা করলে এবং ঔষধ সেবন করলে টাইফয়েড রোগ থেকে পরিত্রান পাওয়া যায়। এই রোগের চিকিৎসায় অনেকগুলো জীবাণুরোধক ঔষধ (Antibiotic) ব্যবহৃত হয়। এখানে কিছু বহুল প্রচলিত জীবানুরোধক ঔষধের নাম দেওয়া হলঃ

- সিপ্রোফ্লক্সাসিন (Ciprofloxacin)
- সেফিকজিম (Cefixime)
- এজিথ্রোমাইসিন (Azithromycin)
- ক্লোরামফেনিকল (Chloramfenicol)
- এমক্সিসিলিন (Amoxycilin)
- কেট্রাইমক্সাজল (Cotrimoxazol)

ছবির বর্ণনা দ্বারা রোগ নির্ণয়

প্রস্টেট ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ দ্বারা স্তন বৃদ্ধি

এক জন ৬০ বছর বয়সী ভদ্রলোক দুই দিকের স্তন বড় (গাইনোকোমেসিয়া) নিয়ে হসপিটালে এসেছিলেন। এই ভদ্রলোকের রোগের ইতিহাস নিয়ে জানা যায় যে ৪ বছর আগে সে রঁঞ্জনরশ্মি (রেডিওথেরাপী) ও হরমোন থেরাপি দ্বারা প্রস্টেট ক্যান্সারের চিকিৎসা করিয়ে ছিল। তিনি রোগের ইতিহাস বর্ণনা দেওয়ার সময় চিকিৎসকে জানিয়ে ছিলেন যে হরমোন থেরাপি দেবার ৬ মাস এর মধ্যে তার দুই দিকের স্তন বড় হয়ে যায় (গাইনোকোমেসিয়া) এবং ব্যথা অনুভূত হয়। হরমোন থেরাপি বন্ধ করার পর তার স্তনের ব্যথা চলে যায় কিন্তু স্তনের আকার অপরিবর্তিত থাকে, যা তাকে সামাজিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। চিকিৎসক শারীরিক পরীক্ষার সময় স্তনে কোন সন্দেহজনক ও অস্বাভাবিক কিছু পাননি। তারপর শল্য চিকিৎসা করে তার বৃদ্বিপ্রাপ্ত স্তনের সংশোধন করা হয়। এখানে বর্ণিত হয় যে, যে সকল রোগী ননস্টেরয়ডাল এ্যান্টিএন্ড্রজেনস (উদাহরণঃ Bicalutamide, Flutamide) দ্বারা হরমোন চিকিৎসা নেয়, তাদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ রোগীর ৬ থেকে ৯ মাসের ভিতর স্তন বড় (গাইনোকোমেসিয়া) হয়।

বাকযন্ত্রে প্যারাসাইটের সংক্রমণ

এক জন ২৫ বছর বয়সী মহিলা ১ সপ্তাহের গলা চুলকানি ও কাশির ইতিহাস নিয়ে চিকিৎসক এর কাছে উপস্থিত হয়েছিল। শারীরিক পরীক্ষায় সময় প্রকাশ পায় যে তার মুখের ঝিল্লী এর হাইপারমিয়া (Hyperemia) হয়েছে। ফাইবার অপটিক-ল্যারিঙ্গস্কোপী করে দেখা যায় যে একটি প্যারাসাইট তার বাম এরিটিনয়েডসের (Arytenoids) ল্যারিনজিয়াল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী পৃষ্ঠে আটকে আছে যার পরিমাপ হল ২ মিমি x ৪ মিমি। ফাইবার ক্লাম্প দ্বারা একে সরানোর পরে দেখা গেল যে এটা একটা জীবিত প্রাপ্তবয়স্ক প্যারাসাইট *(Clonorchis sinensis)*। পরীক্ষা করে দেখা গেল যে তার অ্যান্টি-সি, sinensis IgG ইতিবাচক এবং তার যকৃতের কার্যকারিতা পরীক্ষার ফলাফল ছিল স্বাভাবিক। প্যারাসাইট অপসারণের পরে রোগীর সমস্যাগুলি দ্রুত ভাল হয়ে গেল। এই রোগীকে ২ দিন Praziquantel দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল। ১৬ মাস ক্রমাগত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল রোগী ভাল আছে। এই রোগের প্যারাসাইট সাধারণত স্বাদু পানির কাঁচা মাছ বা চিংড়ি মাছ খেলে যকৃতকে সংক্রামিত করে পরে তা যকৃত হতে বাকযন্ত্র, পিত্তনালী, পিত্তথলিকে আক্রান্ত করতে পারে।

জরুরী পদ্ধতি

সি পি আর

সি পি আর কি?

সি পি আর হৃদপিণ্ডকে উজ্জীবিত করার একটি জরুরী পদ্ধতি, যার দ্বারা একজন ব্যক্তির বন্ধ হয়ে যাওয়া হৃদপিণ্ডকে পুনরায় সঞ্চালিত করা যায়।

হৃদপিণ্ড বন্ধ হওয়ার কারণসমূহ

- হৃদরোগ।
- পানিতে ডুবে যাওয়া।
- সাফোকেসন।
- বিষাক্ত গ্যাস দ্বারা আক্রান্ত।
- মাথায় আঘাত পাওয়া।
- ড্রাগ অপরিমিত মাত্রায় নেওয়া।
- ইলেকট্রিক শক।

সি পি আর এর পদ্ধতি

প্রথমে আক্রান্ত ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে দেখতে হবে যে সে সচেতন আছে কিনা। তারপর আক্রান্ত ব্যক্তিকে আলতো করে স্পর্শ করতে হবে এবং তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করতে হবে। অতঃপর তাকে

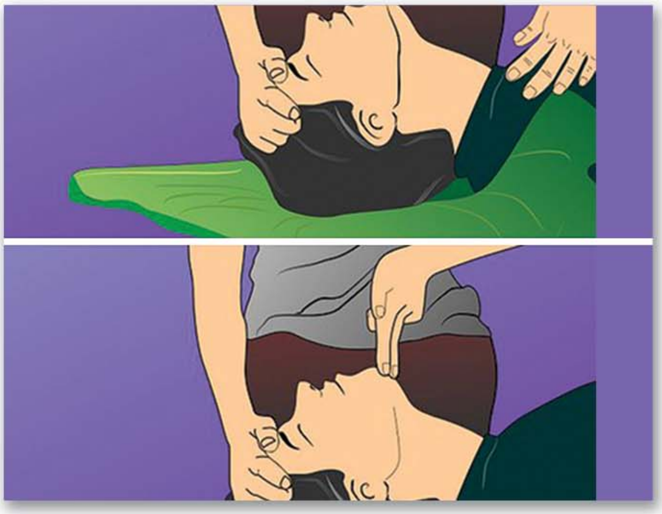

জেগে উঠানোর চেষ্টা করতে হবে। তার পরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে না নাড়িয়ে তার শ্বাসনালী পরীক্ষা করতে হবে। খুব সতর্কের সাথে আক্রান্ত ব্যক্তির মাথা পেছনে নিতে হবে এবং তার মুখ খুলে দেখতে হবে। যদি মুখের ভেতর তরল পদার্থ বা ফরেন বডি বস্তু থাকে তা অতিদ্রুত বের করে আনতে হবে। এটা করতে অনেক সময় ব্যয় করা যাবে না কারন এর থেকে সি পি আর বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এরপর আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস পরীক্ষা করতে হবে, যদি তার শ্বাস বন্ধ থাকে তখন সি পি আর এর প্রথম ধাপ (বুকে চাপ দিতে হবে) শুরু করতে হবে।

প্রথম ধাপ (বুকে চাপ দেওয়া)

আক্রান্ত ব্যক্তির বুকে (ব্রেস্ট বোন এর নীচে) এক হাতের তালু রাখুন। অন্য হাত প্রথম হাতের উপর রাখুন এবং আপনার আঙ্গুল পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ করুন। তার পরে বুকে (ব্রেস্ট বোনের নিচের দিকে) মসৃণ ভাবে ৩০ বার চাপতে থাকুন এবং তার মুখে ২ বার শ্বাস দেন। বুকে চাপ আর মুখে শ্বাস এই অনুপাতে সি পি আর দিতে থাকুন এবং এই ভাবে ২ মিনিটে ৫ বার করুন।

দ্বিতীয় ধাপ (মুখ থেকে মুখে শ্বাস দেওয়া)

সাধারন ভাবে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি শ্বাস না নেয় তখন মাথা পিছনের দিকে কাত করে চিবুক একটু উচু করে শ্বাসনালী খুলুন। আপনার আঙুল দিয়ে তার নাক (Nostrils) বন্ধ করুন। আক্রান্ত ব্যক্তির মুখের উপরে আপনার মুখ রাখুন এবং তার মুখে শ্বাস দেন। আক্রান্ত ব্যক্তির মুখে ২ বার পূর্ণ শ্বাস দিন এবং নিশ্চিত করুন আপনার শ্বাস দেওয়া বায়ু যেন বের হয়ে না যায়। বুকের দিকে লক্ষ রাখুন (বুক ক্রমবর্ধমান স্খলন এবং প্রসারন হচ্ছে কিনা)। যদি বুক ক্রমবর্ধমান স্খলন এবং প্রসারন না হয়, তখন চেক করুন যে আপনি তার নাক (Nostrils) শক্তভাবে ধরে আছেন কিনা এবং আপনার মুখ তার মুখের সাথে লেগে আছে কিনা। যদি দেখেন তার মুখ থেকে বায়ু বের হচ্ছে না তখন শ্বাসনালী আবার পরীক্ষা করুন। এই ভাবে সি পি আর চালিয়ে যান, পেশাগত সাহায্য না আসা পর্যন্ত।

স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য

সন্তানের ওপর মা বাবার রক্তের গ্রুপের প্রভাব

মায়ের রক্তের গ্রুপ এবং তাঁর সন্তানের রক্তের গ্রুপ দুটোর সমীকরণের ফলাফল গর্ভস্থ ভ্রূণ বা নবজাতকের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। ধরা যাক, গর্ভধারিণী মায়ের রক্তের গ্রুপ আরএইচ নেগেটিভ এবং তাঁর স্বামীর রক্তের গ্রুপ আরএইচ পজেটিভ। এই যোগসূত্রে আরএইচ পজেটিভ শিশুর জন্ম হতে পারে। এই মা যদি আগে থেকে আরএইচ রক্তকোষ দ্বারা সংবেদনশীল থাকেন, তাহলে গর্ভস্থ আরএইচ পজেটিভ বাচ্চা আরএইচ হিমোলাইটিক অসুখে কোনো না কোনো মাত্রায় আক্রান্ত হবে। আর মা যদি ডেলিভারির পরে প্রতিক্রিয়ার আওতায় আসেন, সে ক্ষেত্রে পরবর্তী সব আরএইচ পজেটিভ গর্ভস্থ শিশু ঝুঁকিতে থাকবে। আরএইচ (রিসাস) ব্লাড গ্রুপ ও-এ-বি ব্লাড সিস্টেমের সাথে কারো শরীরে রক্ত সঞ্চালন কিংবা নবজাতক শিশুতে মারাত্মক হেমোলাইটিক ডিজিস তৈরিতে আরএইচ ব্লাড গ্রুপ খুব গুরুত্বপূর্ণ।

এবিও রক্তের গ্রুপ সিস্টেম

- একদা যুদ্ধক্ষেত্রের অনুমান-পর্যবেক্ষণসিদ্ধ তথ্য গবেষণায় জানা গেছে, মূল রক্তের গ্রুপ হলো চারটি: এ, বি, এবি এবং ও। ও রক্তের গ্রুপ যেকোনো রক্তের শ্রেণীতে মেশালে তা জমাট বাঁধে না। তাই একে ইউনিভার্সেল ডোনার বলা হয়।
- এ গ্রুপের রক্ত এ অথবা এবির সঙ্গে মিশতে পারে যদি তা বি বা ও-এর সঙ্গে মেশে, তবে জমাট বাঁধবে।
- একইভাবে বি রক্তকোষ শ্রেণী নিরাপদে বি বা এবির সঙ্গে মেশানো যায়, কখনো ও বা এ-এর সঙ্গে নয়।
- এবি রক্তের শ্রেণী শুধু এবির সঙ্গে মেশে আর কারও সঙ্গে নয়।

তবে প্রধান এই চার রক্তের গ্রুপ অ্যান্টিজেনের বাইরেও ক্যাপিটাল সি, স্মল সি, ডি, বড় ই-ছোট ই, বড় কে, ছোট কে, এম, এন এবং আরও অনেক জট পাকানো রক্তশ্রেণীর অস্তিত্ব রয়েছে।

আরএইচ ডি রক্তের শ্রেণীর গরমিল

ভাগ্য ভালো, সব রক্তশ্রেণী সমস্যা তৈরি করে না। কিন্তু ডি অ্যান্টিজেনের গরমিলের চিত্র খুব ভয়াবহ হতে পারে।

- তবে মাতা-পিতা দুজনই যদি ডি নেগেটিভ হন, বাচ্চা কখনো ডি পজেটিভ হবে না। সুতরাং বিপদমুক্ত।
- কিন্তু ডি নেগেটিভ মায়ের সঙ্গে ডি পজেটিভ স্বামীর যোগসূত্রে বাচ্চা ডি পজেটিভ, ডি নেগেটিভ দুটোর যেকোনো একটা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ডি পজেটিভ বাচ্চা হলেই কেবল বিপদ।
- গর্ভস্থ ভ্রূণ ডি পজেটিভ হলেও প্রথম বাচ্চা এতে আক্রান্ত হয় না। প্রথম বাচ্চা জন্মদানের সময় আরএইচ পজেটিভ রক্তকোষজাত অ্যান্টিডি-অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে, যা পরবর্তী সময়ে গর্ভস্থ শিশু থেকে বা রক্ত সরবরাহতন্ত্রে প্রাপ্ত যেকোনো ডি পজেটিভ রক্তকোষ পেলে সমূহ সমস্যার সম্মুখীন হয়। এভাবে আরএইচ নেগেটিভ মা তাঁর ডি-অ্যান্টিজেন নিয়ে কতটা সংবেদনশীল হয়েছেন, তার মাত্রা মায়ের গর্ভকালীন সিরাম ইনডাইরেক্ট কুম্বসটেস্ট দ্বারা নির্ণয় করা যায়। প্রতিক্রিয়ার মাত্রা যত বেশি হবে, গর্ভস্থ ভ্রূণ তত বেশি ক্ষতির শিকার হবে; যার সর্বাধিক নমুনা হচ্ছে হাইড্রপস ফিটালিস।

প্রতিরোধ

- সবাই অবগত আছেন থ্যালাসেমিয়া সন্তান জন্মদান প্রতিরোধে বিবাহপূর্ব রক্তপরীক্ষা করিয়ে বর বা কনে উভয়ে এ রোগের বাহক কি না জেনে নিয়ে চিকিৎসার আশ্রয় নেওয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও গর্ভপূর্ব হতে মা ও বাবার রক্তশ্রেণী জানা গেলে মা, বাবা ও অনাগত সন্তানের রক্তশ্রেণীর গরমিলজনিত সংকট মোকাবিলায় প্রতিরোধমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা সহজ।
- সব আরএইচ নেগেটিভ মাকে গর্ভকালীন ২৮ ও ৩৪ সপ্তাহে, প্রসব-পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে, গর্ভপূর্ব সময়ে গর্ভপাত, জরায়ু থেকে রক্তপাত হয়ে থাকলে চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী অ্যান্টিডি ইমিউনোগ্লোবুলিন্‌ দেওয়ার মাধ্যমে ভয়ানক এ অসুখ থেকে অনাগত সন্তানকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব।

স্বাস্থ্য সংবাদ

দুধ-চা পান করলে চায়ের গুণ থাকে না

মানুষ পানির পর পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পান করে যে পানীয়, তা হলো চা। চা-স্পৃহা চঞ্চল হলে চাতকের মতো চা পানের জন্য উদগ্রীব হন অনেকে। চা পান না করা পর্যন্ত যেন শরীর ও মন দুটোরই তৃষ্ণা মেটে না। চা যে হিতকরী পানীয়, তা এখন অনেকেই জেনেছেন। চায়ের মধ্যে রয়েছে প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও অন্যান্য যৌগ।

গবেষণায় দেখা গেছে, চা পান করলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার হয়, এমনকি কোষের ক্ষতি, জরা অনেকটাই হ্রাস পায়। কোনো কোনো গবেষক বলেন, দাঁতে ক্ষয়, গহ্বর তৈরি হওয়া অনেকটা বাধা পায় চা পানে, রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য হয়। সম্ভবত এর হৃদহিতকারী গুণও রয়েছে। চায়ের মধ্যে রয়েছে যে পলিফেনোল (ফ্লাভোনলস ও ক্যাটেচিনস) এদের রয়েছে হৃদসুরক্ষা গুণাগুণ। অনেক দেশে দুধ-চা পান করে মানুষ, আমাদের দেশেও চায়ের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে পান করেন বেশির ভাগ লোক। কিন্তু ইদানীং গবেষকেরা দেখছেন, চায়ের মধ্যে দুধ মেশালে চায়ের অনেক হিতকরী গুণ আর থাকে না। ইউরোপিয়ান হার্ট জার্নাল-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে গবেষকেরা দেখিয়েছেন, ১৬ জন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক লোক পান করলেন ব্ল্যাক টি (শুধু চা), কেউ পান করলেন চায়ের সঙ্গে স্কিম মিল্ক মিশিয়ে, কেউ পান করলেন শুধু গরম পানি। এরপর বিজ্ঞানীরা রক্তনালির কার্যকলাপের ওপর এদের প্রভাব লক্ষ করলেন।

পানির সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেল, ব্ল্যাক টি (শুধু চা, যাকে আমরা র টি বলি) পানে ধমনির কার্যকলাপ বেশ উন্নত হলো। তবে দুধ-চা পান করলে চায়ের হিতকরী প্রভাব পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল। ইঁদুরজাতীয় প্রাণীতে তেমন পরীক্ষা চালিয়েও একই ফলাফল পাওয়া গেল। তাঁদের ধারণা, দুধের প্রোটিন চায়ের অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ায় চায়ের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। গবেষকেরা বলেন, দুধ রক্তনালির কার্যকলাপের ওপর চায়ের স্বাস্থ্য হিতকরী গুণের বিরুদ্ধাচরণ করে। বিষয়টি কেবল দুধ ও দুধজাত দ্রব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয়, দুধের প্রোটিনও একইভাবে চায়ের অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের ওপর বিরুদ্ধ প্রভাব ফেলে। তাই দুধে চা মেশালে চায়ের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। দুধ-চা পান না করে কেবল র টি (রং চা) পান করুন।

বাইসাইকেল চালান, সুস্থ থাকুন

জীবনের কাছ থেকে যা চাই তা হলো, শরীর ভালো থাকা আর মন ভালো থাকা। যদি স্বাস্থ্যের উন্নতি চাই, ভালো থাকতে চাই, তা হলে খেতে হবে ভালো খাবার, পুষ্টিকর খাবার আর করতে হবে নিয়মিত শরীরচর্চা। এভাবে সৃষ্টি হবে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের অভ্যাস।এ জন্য চাই দিনে মাত্র ৩০ মিনিটের মাঝারি ব্যায়াম। ভালো থাকতে হলে সাইকেল চালাতে হবে ৩০ মিনিট প্রতিদিন। ফিটনেস উন্নত করতে হলে এবং বজায় রাখার চমৎকার উপায় হলো বাইসাইকেল চালানো দিনে মাত্র ৩০ মিনিট বাইসাইকেল চালালে ডায়াবেটিস ও স্থূলতার ঝুঁকি অর্ধেক কমে আসে। বাইসাইকেল চালালে শরীরের প্রধান পেশিগুলোর ব্যায়াম হয়, ওপরে উঠে আসে হৃৎস্পন্দন হারও। বাইসাইকেল চালানো কম চাপ ফেলে শরীরে। অন্যান্য ব্যায়ামের চেয়ে এটা হাড়ের গিঁটগুলোর ওপর অনেক কম চাপ ফেলে, তাই এগুলো আহত হয় অনেক কম। শরীরচর্চা হিসেবে সাইকেল চালালে নিম্নে বর্ণিত ঝুঁকিগুলো অনেক অংশে হ্রাস পায়।

- সাইকেলচালানো হৃদরোগ, স্ট্রোক ও রক্তচাপ প্রতিরোধে সাহায্য করে।
- টাইপ ২ ডায়াবেটিস ও কিছু কিছু ক্যানসারের ঝুঁকি হ্রাস করে।
- সুস্থ, মজবুত হাড়, পেশি ও অস্থিসন্ধি নির্মাণে ও বজায় রাখতে সাহায্য করে। আহত হওয়ার ঝুঁকিও কমে।
- শরীর ভালো রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক।
- নিয়মিত ব্যায়ামে বয়স্ক লোকের যেসব স্বাস্থ্যহিত হয়, সেসব পাওয়া যায়।
- শরীরের নিত্যদিনের কাজকর্ম ও স্বাধীনভাবে জীবনযাপনে হয় সহায়ক।
- সামাজিক মেলামেশা বাড়ে, জীবনের গুণগত মান বাড়ে, বিষণ্ণতা কমে।
- সুস্থ, মজবুত হাড় গঠনে ও হাড়ের গিঁট ও পেশি গঠনেও বজায় রাখতে সহায়ক হয়, হঠাৎ পতনে আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা কমে।

উচ্চ আবহাওয়ায়, কড়া রোদে শরীরচর্চা করার সঙ্গে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। নিরাপদে সাইকেল চালান। এতে সুফল পাওয়া যেমন সম্ভব হবে, তেমনি অভিজ্ঞতা হবে উপভোগ্য।

মুটিয়ে যাওয়া মস্তিষ্কের ক্ষতি করে

মুটিয়ে যাওয়া কেবল ভুঁড়ি আর ওজনই বাড়ায় না, মানসিক কর্মকাণ্ডেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমে ভোঁতা হয়ে যায় মানুষের বোধশক্তি। এমনটাই দাবি করেছেন এক দল ব্রিটিশ গবেষক। তাঁদের এই গবেষণাবিষয়ক নিবন্ধ বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী নিওরোলজিতে প্রকাশিত হয়েছে। মুটিয়ে যাওয়ার কারণে মস্তিষ্কে এই ক্ষতিকর প্রভাব কেন পড়ে, এ ব্যাপারে গবেষকেরা নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেননি। তবে রক্তে চিনির পরিমাণ ও কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যাওয়া এর পেছনে ভূমিকা রাখতে পারে বলে তাঁরা মনে করছেন। গবেষকদের তথ্যমতে, খুব বেশি মুটিয়ে যাওয়ার কারণে - ডিমেনশিয়া - নামের এক ধরনের সমস্যা দেখা দেওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা মানুষের স্মৃতি বিলোপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ গবেষণা চালাতে গিয়ে গবেষকেরা এক দশকের বেশি সময় ধরে ছয় হাজারের বেশি লোকের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। গবেষণায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের বয়স ৩৫ থেকে ৫৫ বছর। গবেষকদের তথ্য অনুযায়ী, গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, যারা খুব বেশি স্থূল এবং যাদের শরীরে বিপাকীয় পরিবর্তনও স্বাস্থ্যসম্মত নয়, অন্যদের চেয়ে তাদের মেধাশক্তি বিলোপের হার বেশি। তবে এ গবেষণায় গবেষকেরা কেবল অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেছেন, ডিমেনশিয়া নয়। গবেষণায় অংশ নেওয়া আলঝেইমারস রিসার্চ ইউকের গবেষক শার্লি ক্র্যামার বলেন, মস্তিষ্কের দুর্বল কর্মকাণ্ডের জন্য মুটিয়ে যাওয়া ও বিপাকীয় অস্বাভাবিকতা কেন দায়ী, আমরা এখনো তা জানতে পারিনি। তিনি আরও বলেন, এই গবেষণায় যেমন বুদ্ধি-বিবেচনা কমে যাওয়ার বিষয়টি উঠে এসেছে, এর আগের গবেষণার ফলাফলে ধারণা পাওয়া গেছে যে মাঝবয়সে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খেলে, নিয়মিত ব্যায়াম করলে, ধূমপান না করলে, রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করলে ডিমেনশিয়ার মতো জটিল সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

গরুর দুধ বনাম মায়ের দুধ

খাদ্যশক্তি বিচারে গরুর দুধ ও মায়ের দুধে সমতা থাকলেও পুষ্টিগুণ বিচারে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য।

- গরুর দুধে শ্বেতসার বা ল্যাকটোজের মান প্রতি ডেসিলিটার ৪.৭ গ্রাম, মায়ের দুধে যা ৭.১ গ্রাম। মায়ের দুধের এ ল্যাকটোজ অন্ত্র থেকে ক্যালসিয়াম শোষণ করে নবজাত ও অল্পবয়সী শিশুর দেহ-অস্থি মজবুত করতে সহায়তা করে; সাহায্য করে গ্যালাকটোলিপিড তৈরির মাধ্যমে মস্তিষ্ককোষের বৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনে। শিশু হয় বুদ্ধিমান ও স্বাস্থ্যবান।
- গরুর দুধে আমিষ বা প্রোটিনের পরিমাণ খুব বেশি, যা প্রতি ডেসিলিটারে ৩.১ গ্রাম। এতে আছে ক্যাসিনের আধিক্য। আছে বিটা ল্যাকটোগ্লোবিনের উপস্থিতি। ফলে গরুর দুধ পানরত শিশু অ্যাকজিমা, আন্ত্রিক প্রদাহ ও মলে রক্তক্ষরণের সমস্যায় ভোগে। মায়ের দুধে প্রোটিন প্রতি ডেসিলিটারে ১.০৬ গ্রাম, শিশুর প্রয়োজনমতোই স্বাভাবিক।
- গরুর দুধে চর্বি আছে প্রতি ডেসিলিটারে ৩.৮ গ্রাম, পরিমাণে তা মায়ের দুধের চেয়ে কম। আর নেই অতিজরুরি ফ্যাটি এসিড, যা শিশুর মস্তিষ্কের বৃদ্ধি বিকাশের জন্য একান্ত জরুরি।
- গরুর দুধে সোডিয়ামের মাত্রা প্রতি ডেসিলিটারে ০.৭৭ গ্রাম, যা মায়ের দুধের চার গুণেরও বেশি। ক্যালসিয়াম ০.৪ গুণ, পটাশিয়াম ৩ গুণ ও ফসফরাস প্রায় সাড়ে ৬ গুণেরও বেশি। শুধু প্রয়োজনীয় জিংক ছাড়া অন্যান্য খনিজ পদার্থ, যেমন ম্যাগনেশিয়াম প্রভৃতি আছে বেশি মাত্রায়। এক বছরের কম বয়সী শিশুকে গরুর দুধ খাওয়ানো হলে এই অতিরিক্ত মাত্রার আমিষ ও খনিজ পদার্থ নিষ্কাশনে কিডনি বহু বিপত্তির সম্মুখীন হয়। গরুর দুধে অল্পবয়সী শিশুতে শোষিত হওয়ার মতো আয়রন কম পরিমাণে থাকে। ফলে এ বয়সে গরুর দুধ পানরত শিশু রক্তস্বল্পতার শিকার হয়।
- গরুর দুধে কমবয়সী শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় এ ও সি ভিটামিন আছে কম মাত্রায়, আর কম মাত্রায় আছে ভিটামিন ই শিশুকে মায়ের দুধ না দিলে গরুর দুধে নির্ভরশীল শিশুর ভিটামিনের স্বল্পতাজনিত অসুখ, যেমন রাতকানা, স্কার্ভি প্রভৃতি হতে পারে।
- মায়ের দুধে শিশুর জন্য রোগপ্রতিরোধক যে শক্তিকাঠামো মজুদ আছে, যেমন ইমিউনোগ্লোবিউলিন ও লিউকোসাইট, ম্যাক্রোফেজ, নিউট্রোফিল যা নেই গরুর দুধে। তাই গরুর দুধ পানে নির্ভরশীল শিশু সহজে রোগে আক্রান্ত হয়।

ইনফো কুইজ

ইনফো মেডিকাসের সাথে সংযুক্ত বিজনেস রিপলাই কার্ডের ইনফো কুইজ অংশে সঠিক উত্তরে (√) চিহ্ন দিন এবং এটি ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ইং তারিখের মধ্যে আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করুন।

১. গর্ভবতী মায়ের লক্ষণগুলো নয় কোনটি?

ক) মাসিক বন্ধ থাকা

খ) বমি বমি ভাব

গ) স্তনে ব্যথা

ঘ) মাথা ব্যথা

২. সমগ্র গর্ভকালীন সময়ে কমপক্ষে কতবার চিকিৎসকের নিকট যেয়ে পরীক্ষা করা প্রয়োজন?

ক) ২ বার

খ) ৩ বার

গ) ৪ বার

ঘ) ৬ বার

৩. গর্ভাবস্থায় ও প্রসবের সময় বিপদজনক চিহ্ন কয়টি?

ক) ৩ টি

খ) ৫ টি

গ) ৭ টি

ঘ) ৯ টি

৪. কি কি কারনে হাইপারথাইরয়েডিজম হয়?

ক) থাইরয়েড গ্রন্থি ছোট হয়ে গেলে

খ) থাইরয়েড গ্রন্থি বড় হয়ে গেলে

গ) থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে অত্যাধিক হর্মোন ক্ষরন না হলে

ঘ) অত্যাধিক আয়োডিনের প্রভাবে

৫. হাইপোথাইরয়েডিজমের রোগলক্ষণ নয় কোনটি?

ক) ক্লান্তিভাব

খ) ওজন বৃদ্ধি

গ) থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে ওঠা

ঘ) গলার স্বর ভেঙ্গে যাওয়া

৬. হাইপারথাইরয়েডইজম-এর লক্ষণ নয় কোনটি?

ক) ঠান্ডা সহ্য না করতে পারা

খ) নার্ভাস বা খিটখিটে আচরণ

গ) পেশী-কাপা বা পেশীতে জোরের অভাব

ঘ) গরমে অসুবিধা হওয়া

৭. গলস্টোন রোগের লক্ষণগুলো কি কি?

ক) পেট খালি লাগা

খ) মাঝে মাঝে তীব্র ব্যথা ও তার সঙ্গে বমি হওয়া

গ) পেটের উপরের দিকে ও ডান পাশে ব্যথা

ঘ) পেটের নিচের দিকে ও বাম পাশে ব্যথা

৮. টাইফয়েডের প্রথম সপ্তাহের লক্ষণগুলো কি কি?

ক) মাথা ব্যথা

খ) ঠোঁট ফেটে যাওয়া

গ) গা, হাত ও পা এ ব্যথা হওয়া

ঘ) জিহ্বা শুকিয়ে যাওয়া

৯. টাইফয়েডের দ্বিতীয় সপ্তাহের লক্ষণগুলো কি কি?

ক) ঠোঁটের কোন ফেটে ঘা মত হতে পারে

খ) বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া

গ) এক সপ্তাহের শেষের দিকে রোগী প্রলাপ বকতে থাকে

ঘ) জ্বর ৯৯° - ১০০° ফাঃ এর মধ্যে থাকে

১০. টাইফয়েডের তৃতীয় সপ্তাহের লক্ষণগুলো কি কি?

ক) এই সপ্তাহে রোগীর তাপমাত্রা কমে যায় এবং স্বাভাবিক হয়ে যায়

খ) এই সপ্তাহে শেষের দিকে তাপমাত্রা কিছু কমে

গ) এই সপ্তাহে আবার জ্বরের প্রার্দুভাব হতে পারে

ঘ) হাত, পা ও জিহ্বাতে কম্পন দেখা যায়

এসিআই লিমিটেড